বাংলাদেশ এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়নঃ ভুলে যাওয়া সংযোগসমূহ

বৈশ্বিক সহযোগিতা কোন দয়া-দাক্ষিণ্য নয়, এটা ধনী দেশসমূহের দায় এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য আমাদের অধিকার

১.এসডিজি এবং বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন প্রেক্ষাপট

২০১৫ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বা এমডিজি'র মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন করে বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়। সেই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ এবং সকল দেশের অংশগ্রহণে পরবর্তী ১৫ বছর (২০১৬-২০৩০ সাল) পর্যন্ত "টেকসই উন্নয়ন লক্ষসমূহ বা এসডিজি" নামে নতুন ১৭টি বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের কৌশলও গ্রহণ করা হয়।

এটা বলা যায় যে, এমডিজি বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহই ছিল জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বপ্রথম বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য, যা ২০০০ সালে গৃহীত হয়েছিল। এর পূর্বে অবশ্য জাতিসংঘ এ ধরনের উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করে নাই। আবার এটাও বলা যায় যে, এমডিজি কৌশল গ্রহণের সময় কেউই একথা চিন্তা করে নাই যে, এই কৌশলের মাধ্যমেই বৈশ্বিক সমস্যাসমূহকে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। তথাপি এটা এখন বলা যায়, এমডিজি সময়ে বা গত ১৫ বছরে এমডিজি'র অনেক বিষয়ে বৈশ্বিক অগ্রগতি তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে। যে কারণে ২০১৫ সাল পরবর্তী সময়ে এমডিজি'র বিকল্প হিসেবে নতুন করে উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে বৈশ্বিকভাবেই গুরুত্ব বেড়ে যায়। বাংলাদেশের কাছেও এমডিজি-পরবর্তী বৈশ্বিক উন্নয়ন কৌশল অনেক গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ বিগত ১৫ বছরে দারিদ্র নিরসন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এমডিজি'র মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্জন সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। দারিদ্র দূরীকরণে বাংলাদেশের অর্জন ও সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ জাতিসংঘ এমডিজি পুরস্কার লাভ করেছে।

২. এমডিজি'র সাফল্যই এসডিজি অর্জনের পথ প্রদর্শক

এমডিজির সাফল্য বাংলাদেশকে উৎসাহিত করেছে নতুন করে বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য বিশেষ করে এসডিজি বাস্তবায়ন কাতারে নিজেকে সামিল করা এবং আরও একটি সাফল্যের উদাহরণ সৃষ্টির সুযোগ করার। এমডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশই হচ্ছে বিশ্বের কাছে একমাত্র উদাহরণ। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ, যে কিনা সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এবং নির্ধারিত সময়ের তিন বছর আগেই দারিদ্র দূরীকরণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পেরেছে। ২০০০ সালে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হার ছিল ৪৮%, পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুসারে সেটা বর্তমানে হ্রাস পেয়ে ২২.৪% এ নেমে এসেছে। একইভাবে এমডিজি'র অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হার ১০০% এবং লিঙ্গ সমতা অর্জন, শিশু মৃত্যুর হার ৯২ থেকে ৪৬-এ (প্রতি ১০০০০০ জন্ম হারে) হ্রাস এবং নিরাপদ পানি ও পয়ঃ-নিষ্কাশন ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের অর্জন আমাদের বিশ্বের কাছে প্রশংশিত হয়েছে। এমডিজি'র এই অর্জনই ২০৩০ সাল নাগাদ দেশকে পূর্ণ দারিদ্রমুক্ত করার ক্ষেত্রে আমাদেরকে আশাব্যঞ্জক করে তুলছে, তেমনি এসডিজি অর্জনেও নিজেদের সক্ষমতা বিষয়ে সরকারকে আস্থাবান করে তুলেছে।

৩. এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে সরকারের উদ্যোগ

৩.১ পরিকল্পনা পর্যায়ে উদ্যোগ

ক. সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজিসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০ সাল) প্রক্ষেপিত কৌশল এবং প্রস্তাবিত কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা করে এটা পরিষ্কারভাবেই বলা যায় যে, এসডিজি'র সকল লক্ষ্যসমূহই উক্ত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি বিষয়ক বৈশ্বিক পরিকল্পনা একই সময়ে চলছিল। এসডিজি' বৈশ্বিক পরকিল্পনা প্রণয়ণে বাংলাদেশ সরকারের নিজেরই অগ্রবর্তী ভূমিকা থাকার কারণে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি বিষয়ক কর্মকৌশলের প্রতিফলন বৈশ্বিকভাবে আকাঙ্খিত ছিল এবং তা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন পরকিল্পনায়ই দারিদ্রতা দূরীকরণ ছিল সরকারের অগ্রাধিকার লক্ষ্য এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও এর কোন হেরফের দেখা যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, এসডিজি'র প্রধান লক্ষ্যটিই (সকল পর্যায়ে দারিদ্র দূরীকরণ) ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যেখানে টেকসই উন্নয়নে দারিদ্র

দূরীকরণই হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান অর্জনযোগ্য কৌশল। যদিও বিগত দশকগুলোতে দারিদ্র দূরীকরণে বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য, তথাপি মোট জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ দারিদ্রতার সীমায় বাস করছে। সরকারি হিসাব অনুসারে তা এখন পর্যন্ত ২২.% এর বেশী। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে তাল মিলিয়ে বিগত দশকগুলোতে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের হার কাংঙ্খিত পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ সমন্বিত হয়েছে এটা সত্য তবে প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটাই অর্থাৎ দারিদ্রতা লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা ভিত্তিক) ও প্রত্যাশা (জীবন-মান উন্নয়ন ও মর্যাদা ভিত্তিক) অনুযায়ী হ্রাস করা।

সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	সমন্বিত বিষয়সমূহ (উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ)
লক্ষ্যমাত্রা-১ঃ সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করা।	১. মাথাপিছু দারিদ্র্যের হার ৬.২ শতাংশ হ্রাস করা (২৪.৮% থেকে ১৮.৬% কমিয়ে নিয়ে আসা) ২. অতি দারিদ্র্যতা হার প্রায় ৪.০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো (২০২০ সালের মধ্যে অতি দারিদ্র্যতা হার ৮.৯% নিয়ে আসা) ৩. সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় জিডিপি'র ২.৩% হারে বর্ধিত করা হবে। ৪. পিছিয়ে পরা অঞ্চলের জন্য তহবিল গঠন করা
লক্ষ্যমাত্রা-২ঃ ক্ষুধা নির্মূল, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি মান উন্নতকরন লক্ষ্য অর্জন এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু	১. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নির্দেশিত খাদ্য হস্তান্তর কর্মসুচি জোড়দার এবং সংহতকরণ। ২. পাঁচ বছরের কম বয়সের খর্বকায় শিশুদের হার ৩৬.১% থেকে ২৫% এ কমিয়ে আনা হবে। ৩. পাঁচ বছরের কম বয়সের কম ওজনের শিশুদের হার ৩২.৬% থেকে ২০% কমিয়ে আনা হবে।
লক্ষ্যমাত্রা-৩ঃ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা এ সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা।	১. পাঁচ বছরের কম বয়সি প্রতি ১০০০ শিশুদের মৃত্যুর হার ৪১ থেকে ৩৭ কমিয়ে। ২. মাতৃমৃত্যুর হার ১৭০ থেকে ১০৫ জনে কমিয়ে আনা হবে প্রতি ১০০,০০০ এ। ৩. টিকাদান, হামের (১২ মাস বয়সের নিচের শিশুদের) টিকা ১০০% এ উন্নীত করা হবে। ৪. জন্ম ক্ষেত্রে দক্ষ স্বাস্থ্য কর্মীর হার ৬৫ % এ উন্নীত করা হবে। ৫. মোট প্রজনন (ফার্টিলিটি) হার ২.০ এ নামিয়ে আনা হবে। ৬. গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা ব্যবহারের হার ৭৫% করা হবে।
লক্ষ্যমাত্রা-৪ঃ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা-ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।	১. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নিট ভর্তির হার ১০০% অর্জন। ২. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা। ৩.৫ম গ্রেডে পৌছানোর হার ৮০% থেকে বাড়িয়ে ১০০% করা হবে।

সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	সমন্বিত বিষয়সমূহ (উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ)
লক্ষ্যমাত্রা-৫ঃ লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করা।	১. মাধ্যমিক পরবর্তী বা তৃতীয় পর্যায় শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা সূচক ০.৭০ থেকে ১.০ এ উন্নীত করা। ২. ২০-২৪ বয়সের শিক্ষিত নারী-পুরুষ অনুপাত ৮৬% থেকে ১০০% এ বৃদ্ধি করা। ৩. ২০২০ সালের মধ্যে সরকারি খাতে ২৫% নারী কর্মকর্তা (গ্রেড-৯ এবং তার উপরে) বৃদ্ধি করা।
লক্ষ্যমাত্রা-৬ঃ সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজপ্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।	১. গ্রাম ও শহরের সকল জনগণের জন্য নিরাপদ খাবার পানির ব্যবস্থা করা হবে। ২. শহরের জনগণের জন্য ১০০% এবং গ্রামের জনগণের জন্য ৯০% স্যানিটারি ল্যাট্রিনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।
লক্ষ্যমাত্রা-৭ঃ সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করা।	১. ২৩০০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। ২. ৯৬% এলাকায় বিদ্যুতের সম্পসারণ করা হবে। ৩. শক্তির ব্যবহার দক্ষতা ১০% পর্যন্ত বাড়ানো হবে।
লক্ষ্যমাত্রা-৮ঃ সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।	১. পরিকল্পিত সময়কালে গড়ে প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৪% হারে অর্জন করা। ২. ২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে মোট রাজস্ব জিডিপির হার ১০.৭% থেকে ১৬.১% বৃদ্ধি করা হবে। ৩. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে ১২.৯ মিলিয়ন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে এর মধ্যে প্রায় ২ মিলিয়ন চাকরি বিদেশে হবে। ৪. ২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ বা এফডিআই ১.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে ৯.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি করা হবে।
লক্ষ্যমাত্রা-৯ঃ প্রতিরোধসক্ষম ও সহনশীল অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবনে উৎসাহিত করা।	১. রূপান্তরমূলক অবকাঠামো প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া। ২. জিডিপি'তে উৎপাদন খাতের অবদান ১৭.৮% থেকে ২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে ২১.৫% এ বৃদ্ধি করা।
লক্ষ্যমাত্রা-১০ঃ দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা।	১. সামাজিক নিরাপত্তাতে খাতে ব্যয় জিডিপির ২.৩% হারে বৃদ্ধি করা । ২. আয় বৈষম্য বা অসমতা সূচক ০.৪৫৮ থেকে কমিয়ে আরো নিম্নগামী করা।
লক্ষ্যমাত্রা-১১ঃ নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও সহনশীল করে তোলা।	১. নগরের সকল বাসিন্দার জন্য উন্নত পানির উৎস এবং প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হবে। ২. টেকসই নগর উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে যা বর্ধিত উৎপাদনশীলতা, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানকে সমর্থন করবে।
লক্ষ্যমাত্রা-১২ঃ টেকসই উৎপাদন ও ভোগ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।	কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নাই
লক্ষ্যমাত্রা-১৩ঃ জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	১. প্রকল্প প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অবশ্যই পরিবেশগত বিষয়, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস বিষয়সমূহ সমন্বয় করা। ২. ৫০০ মিটার চওড়া সবুজ বেল্ট নির্মাণ করে উপকূল রক্ষা করা হবে।

সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ	সমন্বিত বিষয়সমূহ (উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ)
লক্ষ্যমাত্রা-১৪ঃ টেকসই উন্নয়নের জন্য মহ-াসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা।	১. সামুদ্রিক জাহাজ এবং জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের দূষণ থেকে রক্ষা করার জন্য আইন ও নিয়মনীতি প্রণয়ন করা।
লক্ষ্যমাত্রা-১৫ঃ পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা।	১. উৎপাদনশীল বনভূমিকে ২০% বর্ধিত করা হবে যেখানে বৃক্ষরাজির ঘনত্ব থাকবে কমপক্ষে ৭০%।
লক্ষ্যমাত্রা-১৬ঃ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায়বিচারের সুযোগ প্রদান করা, এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।	১. সকল ব্যক্তি যাতে আইনের শাসনের অধীনে নিরাপদে বাস করতে পারে তা নিশ্চিত করা। ২. সততা বৃদ্ধি করা এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা। ৩. তথ্য পাওয়ার অধিকার (আরটিএ) এবং তথ্য প্রবেশাধিকারের প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করা। ৪. সংসদীয় ব্যবস্থা/প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করা।
লক্ষ্যমাত্রা-১৭ঃ বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা।	১. উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (এইআইএমএস) উন্নত করা। ২. উন্নয়ন অংশীদারদের নীতিমালাসমূহ দেশীয় উন্নয়ন চাহিদা ও নীতিমালার সাথে সমন্বিতকরণ করা হবে। ৩. উন্নয়নের জন্য কার্যকর জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা। বাংলাদেশে উন্নয়ন সহযোগিতার কৌশল ঠিক করা।

খ. এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন অগ্রাধিকারসমূহ

দারিদ্র দূরীকরণে বাংলাদেশ দ্রুত সাফল্য পেলেও উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদ এবং বিশেষজ্ঞদের মতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সামনে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন শুধুমাত্র দারিদ্র দূরীকরণ লক্ষ্যের উপর নির্ভর করে না। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অবশ্যই দারিদ্র দূরীকরণের পাশাপাশি অগ্রাধিকার আরও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর প্রতি সরকারকে সমানভাবে নজর দিতে হবে। এর মধ্যে বলা যায় চরম দারিদ্রহ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়নে মানসম্মত শিক্ষা, মাতৃ-মৃত্যুর হারহ্রাস করা, জাতীয় পুষ্টি মান উন্নতকরণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। উন্নয়নবিদগণ বলছেন এমডিজি সময়ে বাংলাদেশের এসকল বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে অর্জন উল্লেখযোগ্য নয়, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে স্থবির। উন্নয়নবিদদের এই সূত্র ধরেই আমরা কয়েকটি উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের বর্তমান চিত্রটি কেমন তা বলার চেষ্টা করেছি:

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলেও সমাজে অসাম্য বৃদ্ধি পাচ্ছেঃ বিগত দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনকভাবে অর্জিত হলেও এই প্রবৃদ্ধির সুষম বণ্টন নীতিমালা ও কৌশল গ্রহণ না করার কারণে আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক অসমতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু জাতীয় আয় ৩০০ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫ সালে ১১৫০ ডলার হলেও এই সম্পদের উপর গরিব মানুষের প্রবেশাধিকার ও ভোগ করার অধিকার ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে সরকারের সর্বশেষ পরিসংখ্যানই (খানাভিত্তিক আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০) বলে দিচ্ছে বাংলাদেশে ধনী ও দরিদ্রদের মাঝে আয় ও সম্পদের ব্যবধান ক্রমেই বাড়ছে। সরকারের পরিসংখান আরও বলছে যে, সঠিক উন্নয়ন নীতির অভাবে দরিদ্রতার ভৌগোলিক কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে বিশেষ করে বিগত দশকে তা উপকূলীয় অঞ্চলে স্থানান্তর ও বিস্তার লাভ করেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থায়ও ভৌগোলিক অসমতা ও ঝরে পড়ার হারকে বৃদ্ধি করছেঃ এমডিজি বাস্তবায়ন সময়ে সরকারের সাফল্য হচ্ছে ১০০% ভর্তির হার নিশ্চিত করা এবং লিঙ্গ সমতা অর্জন। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থায় ভৌগোলিক অসমতা বিশেষ করে শহরাঞ্চলে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পক্ষান্তরে মফস্বল এবং অন্যান্য দূরবর্তী অঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি উল্লেখ করতে চাই। কারণ শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান এই ভৌগোলিক অসম সুযোগ-সুবিধার কারণে প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার হার উদ্বেগজনক। পাশাপাশি বিরাজমান অসম সুযোগ-সুবিধার নেতিবাচক ফলাফল হিসেবে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করাও সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। টেকসই উন্নয়নে সরকারের জন্য এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে যদি মানসম্মত মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব না হয় তাহলে আগামী দশকে টেকসই উন্নয়ন দূরের কথা, এই মাথাভারি জনগোষ্ঠী নিয়ে কোন উন্নয়নই সম্ভব হবে বলে

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন না।

পরিবেশ অবক্ষয় সরকারের অনেক উন্নয়ন ব্যয়কে অকার্যকর করতে পারেঃ এমডিজি বাস্তবায়ন সমকালে পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়টি সরকারের উন্নয়ন অগ্রাধিকার পায়নি বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। যে কারণে এক্ষেত্রে অর্জন একরকম স্থবির অবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। উন্নয়নের নামে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে পরিবেশ বিধ্বংসী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এখনোও হচ্ছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তজনিত প্রভাব পরিবেশের অবস্থাকে আরও বিপদাপন্ন করে তুলছে। উন্নয়নের নামে পরিবেশ প্রতিবেশের ক্ষতি স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই চলে আসছে। উদাহরণস্বরূপ ৮০'র দশকে উপকূলীয় এলাকায় নেওয়া চিংড়ি চাষ প্রকল্প। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে নেওয়া এই কর্মসূচির কারণে বর্তমানে সেখানে লবণাক্ততা মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইকো-সিস্টেম ধ্বংস হয়েছে। এর ফলস্বরূপ আক্রান্ত জনগোষ্ঠী স্থানান্তর হতে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে সরকারের গৃহীত অনেক উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে জনগণের নেতিবাচক মনোভাব রয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন এসকল প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন হলে তা পরিবেশ-প্রতিবেশকে আরও বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে এবং তা মোকাবেলায় সরকারকে প্রচুর সম্পদ বিনিয়োগ করতে হবে, যা হয়ত সম্ভব হবে না। সুতরাং উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারকে আরও পরিবেশ-বান্ধব কৌশল গ্রহণ করতে হবে বলে সবাই মনে করেন যদি টেকসই উন্নয়ন আমরা আশা করি।

এমডিজি বাস্তবায়নকালে দেখা যায় যে, সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ে, যে কারণে অন্য সকল বিষয়ে সরকারের কার্যকর উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা ছিল। এসডিজি'র ক্ষেত্রে সরকারকে সকল বিষয়ে সমান গুরুত্ব দিতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এবং সেক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দারিদ্র দূরীকরণের পাশাপাশি অন্যান্য উন্নয়ন বিষয়েও বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি সকল বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে সে অনুসারে কৌশল নির্ধারণ এবং কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩.২. বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরকারের উদ্যোগ

ক. সরকার সকল মন্ত্রণালয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত বাস্তবায়ন কাঠামো প্রণয়ন করেছে

যেহেতু বৈশ্বিক এসডিজি প্রণয়নে বাংলাদেশ সরকারের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সুতরাং বাংলাদেশে এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও সরকাররের প্রতিশ্রুতি রয়েছে সেটা অবশ্যই দেখাতে হবে এবং বাস্তবায়ন করে তা প্রমাণও করতে হবে। তাছাড়া এমডিজিতে সাফল্য অর্জনকারী দেশ হিসেবে এই সরকারের সামনে আরও একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যে, টেকসই উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে একটি উদাহরণ। আমরা মনে করি সরকার বিষয়টি সঠিকভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সে অনুসারেই ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহকে সমন্বিত করেছেন। সর্বপোরি বাস্তবায়ন ও লক্ষসমূহ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়কে লক্ষ্য অনুসারে তাদের দায়িত্বসমূহ ও কর্ম-কৌশল নির্ধারণ করে দিয়েছেন যাতে এসকল মন্ত্রণালয়সমূহ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের ছকে এসডিজি অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালসমূহের দায়িত্ব বিন্যাস দেখানো হয়েছে;

এসডিজি- ১ঃ সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করা

প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা এজেন্সিসমূহ	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ- জিইডি
সহযোগী মন্ত্রণালয় বা এজেন্সিসমূহ	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার, কৃষি, বন, সমাজ কল্যাণ, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ, শিল্প ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়কালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কার্যাবলী	২০২০ সালের মধ্যে অতি দারিদ্র্য ৪.০ শতাংশ কমিয়ে ৮.৯% নিয়ে আসা।
এসডিজি অর্জনের জন্য নীতিমালা তালিকা	জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস)-২০১৫
অগ্রগতি পরিমাপের জন্য প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক	আন্তর্জাতিক দরিদ্রসীমার নিচে জনসংখ্যার অনুপাত লিঙ্গ, বয়স এবং কর্মসংস্থানের অবস্থান চিহ্নিত।

এসডিজি-৩ঃ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা এবং সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা।

প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় বা এজেন্সিসমূহ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সহযোগী মন্ত্রণালয় বা এজেন্সিসমূহ	স্থানীয় সরকার বিভাগ, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তথ্য ও পরিসংখ্যান এবং তথ্য বিভাগ ইত্যাদি।
সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়কালে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কার্যাবলী	সকল গর্ভবতী নারীদের জন্য টিটি টিকাসহ গর্ভকালীন সেবার ব্যবস্থা (এনএনসি) রাখা। সিএসবিএ এর প্রশিক্ষণ, উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সজরুরি ধাত্রী সেবার সম্পসারণ করা। মাতৃত্ব ভাউচার প্রদানের মাধ্যমে অর্থের চাহিদা পাইলটিং করা। গর্ভকালীন সেবা, গর্ভ পরবর্তীকালীন সেবা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারিসমূহ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদা সৃষ্টি করা।
এসডিজি অর্জনের জন্য নীতিমালা তালিকা	জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১ এবং বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতিমালা-২০১২।
অগ্রগতি পরিমাপের জন্য প্রস্তাবিত বৈশ্বিক সূচক	মাতৃমৃত্যুর অনুপাত, পাঁচ বছরের কম বয়সীদের মৃত্যুর হার এবং প্রসবকালীন সময়ে দক্ষ ধাত্রী অংশগ্রহণের হার ইত্যাদি।

উপরের প্রক্ষেপণ ও পরিকল্পনা ছক থেকে এটা স্পষ্ট যে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগীয় দপ্তরসমূহ তাদের লক্ষ অনুসারে কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করবে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করবে। এটা বলা যায় যে, এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারকে তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে যেহেতু সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি'র সকল লক্ষ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে সেক্ষেত্রে ভবিষ্যত পরিকল্পনাসমূহে সঠিক কর্মসূচি, বাস্তবায়ন কৌশল এবং অর্থযোগান নিশ্চিত করতে পারলেই এসডিজি অর্জন অনেক সহজ হবে বলে আমরা মনে করি। এছাড়াও প্রধনমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি মন্ত্রণালয়সমূহের কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি মনিটর এবং প্রয়োজনীয় সহযোগতা নিশ্চিত করবেন।

খ. সরকারের অগ্রাধিকার পরিকল্পনা এবং অর্থ বরাদ্দের কৌশল

এসডিজি বাস্তবায়নে সরকার ৭ম পরিকল্পনার বাইরেও অতিরিক্ত ও প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ যোগানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় অর্থের ঘাটতি রয়েছে। তাছাড়া এসডিজি বাস্তবায়নে কী পরিমাণ অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন হবে তা হিসাবের বাইরে এবং সরকার এখনোও সেটা হিসাব করে নাই। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার সরকারি এবং বেসরকারি উৎস থেকে ৪০৩ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৩২,৩০,৪০০ কোটি টাকা) বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সরকারের এই প্রাক্কলিত বিনিয়োগ পরিকল্পনা সত্যিকার অর্থে এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চাহিদা নির্ভর কি না। পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞগন বলছেন যে, এসডিজি বাস্তবায়নে ৭ম পঞ্চবার্ষিক সময়কালে (২০১৬-২০২০ সাল পর্যন্ত) সরকারকে জিডিপি'র কমপক্ষে ১৮% আভ্যন্তরীণ সম্পদ যোগান নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরকিল্পনা নিজেই বলছে এই হার হতে পারে সর্বোচ্চ ১৪-১৬.২% পর্যন্ত। সুতরাং এসডিজি লক্ষ্যসমূহ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত করলেও গতানুগতিক পরিকল্পনা অনুসরন করে সরকার তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কতটা সফল হবে তার আশংকা থেকে যাচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এমডিজি বাস্তবায়নের সময় আমরা শুধুমাত্র দারিদ্র দূরীকরণ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এর সাফল্য এবং অর্জনকে হিসাব করতাম। কিন্তু এসডিজি বা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংগা অবশ্যই এমডিজি'র চাইতে অধিক সম্প্রসারিত। অর্থাৎ টেকসই উন্নয়ন দারিদ্র দূরীকরণের সাথে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান ও মানবিক বিষয়সমূহের উন্নয়ন সহ অধিকিন্তু পরিবেশ সুরক্ষা এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনার কথাও বলা হচ্ছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শুধু উল্লেখিত এসকল বিষয়সমূহের সমন্বিত উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতি বছর জিডিপি'র কমপক্ষে ২১.১% হারে জাতীয় বাজেটে প্রণয়নের সুপারিশ করার পাশাপাশি পরিকল্পনা সময়কালের শেষ বছরের বাজেট হতে হবে আরও ৫% বেশী। আমরা এমডিজি পিরিয়ডে এসকল খাতে সরকারের ব্যয় দেখেছি জিডিপি'র মাত্র ৯% হারে এবং ৭ম পরিকল্পনায় এই ব্যয় হার বাড়ানো হলেও তা ১৩.৯% এর মত দাড়িয়েছে। তাই এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারকে ব্যয় প্রাক্কলন আসলে অপর্যাপ্ত এটা বলা যায়। এমডিজিতে দারিদ্র দূরীকরণে বাংলাদেশের সাফল্য হচ্ছে সংখ্যাভিত্তিক এবং জাতিসংঘ ঘোষিত আথিক মানদন্ডের (দৈনিক ১ ডলার আয়) উপর ভিত্তি করে। কিন্তু দারিদ্রতার বহুমাত্রিক কারণসমূহ বিবেচনায় আনলে এই দারিদ্রের হার আরও বৃদ্ধি পাবে বলে বিশেষজ্ঞগন মনে করেন। সম্প্রতি টঘ-উঝঈঅচ এর এক জরিপে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিন এশিয়াতে দারীদ্রতার বহুমাত্রিক কারণসমূহ বিবেচনায় বর্তমান সংখ্যাগত দারিদ্রের চাইতে প্রায় তিনগুন বেশী দারিদ্র রয়েছে। সুতরাং টঘ-উঝঈঅচ এর সূত্র ধরে এটা অবশ্যই বলা যায় বাংলাদেশে সরকারের হিসাবের চাইতে তিনগুন বেশী দারিদ্রতা রয়েছে যা আসলে টেকসই উন্নয়নের অন্তরায়। সুতরাং সরকারকে শুধু সংখ্যাগত দারিদ্র হিসাব করে অর্জন হয়েছে একথা বললে চলবে না বরং টেকসই দারিদ্র বিমোচনের জন্য আরও বেশী কিছু করতে হবে।

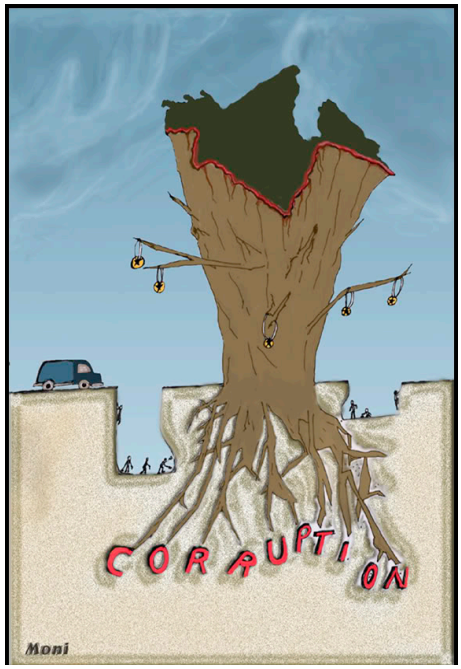

৪. টেকসই উন্নয়ন এবং ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জঃ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়া সংযোগসমূহ

২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে কি কি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তা নিয়ে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞদের অনেক পরামর্শ রয়েছে। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা তথাকথিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমেই টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা যাবে। প্রবৃদ্ধির সুষ্ঠ বণ্টন ও বিনিয়োগ, মানব উন্নয়নে দরিদ্রদের সুযোগ বৃদ্ধি, পরিবেশ সুরক্ষা এবং সর্বোপরি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠাই টেকসই উন্নয়নে বড় অবদান রাখতে পারে বলে সবাই মনে করেন। আমরা টেকসই উন্নয়নে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে সকল বিষয় ভুলে যাওয়া হয়েছে বলে আমরা মনে করি এবং যে সকল বিবেচনার জন্য উন্নয়ন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ রয়েছে সেগুলোর অবতারনা করছি এবং আশা করি যে, টেকসই উন্নয়নে আমাদের সরকার তা বিবেচনায় আনবেন।

ক. আর্থ-সামাজিক অসমতা হ্রাসকরণ সরকারের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত

বৈশ্বিক অথনৈতিক উন্নয়ন আলোচনায় সাম্প্রতিক সময়ে ন্যয্যতাকে ঘিরে বিতর্ক জোরালোভাবে উঠে এসেছে। বাংলাদেশ বার্ষিক ৬% হারে অর্থনৈকিত উন্নয়ন অব্যহত রেখেছে। আর্থিক উন্নয়নের এই হার দেশকে দারিদ্র বিমোচন এবং স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে মধ্যম আয়ের দেশে তুলে আনতে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু আমরা যদি গভীরভাবে দেখি তবে দেখবো যে সরকার সম্পদের সম-বণ্টন এবং দরিদ্র বান্ধব উন্নয়ন না করার ফলে অসমতা ধারাবাহিতভাবে বেড়েই চলেছে। এর মধ্যেও জনগণ হয়তো চরম দরিদ্র অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে কিন্তু তা দেশের উন্নয়ন ফলাফলের উপর নিন্মমুখী প্রভাব ফেলবে। কারণ উন্নয়নের এই ধারার ফলে সম্পদ গুটিকয়েক ধনীলোকের কাছ চলে গেছে। (বাংলাদেশের ১০% ধনী লোক দেশের ১/৩ সম্পদের মালিক; প্রথম আলো ১৪ নভেম্বর ২০১৬)। যেকারণেই হোক এমডিজি অসমতা কমিয়ে আনাকে সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ করার সুযোগ হারিয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে স্থানীয় এবং বৈশ্বিক আন্দোলন হয়েছে। যে কারণে অসমতা কমানো এসডিজির অন্যতম উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্জিত সাফল্য সত্তেও বাংলাদেশে জনগণের মাঝে অসমতা বেড়েই চলেছে। অসমতা পরিমাপক সুচকেও ধনী ও দরিদ্রের আয়ের বৃদ্ধির পার্থক্য হার বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি প্রতি ফলিত (২০১০ এ গিণি-কো ইফেসিয়েন্সি হলো ০.৪৫)। এমডিজির ক্ষেত্রে আরো অভিজ্ঞতা হলো সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য দরিদ্র বন্ধব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাজেট বরাদ্ধ কমিয়েছে। বিপরীতে জাতীয় রাজস্বের বড় একটা অংশ যাচ্ছে রপ্তানি তরান্বিত করা, সরকারি ব্যাংকসমূহে পুন:বিনিয়োগ, যে ব্যাংগুলির টাকা মূলত রাজনৈতিক এবং বড় বড় কোম্পানির দুবৃত্তায়ন মাধ্যমে লুট করা হয়েছে।

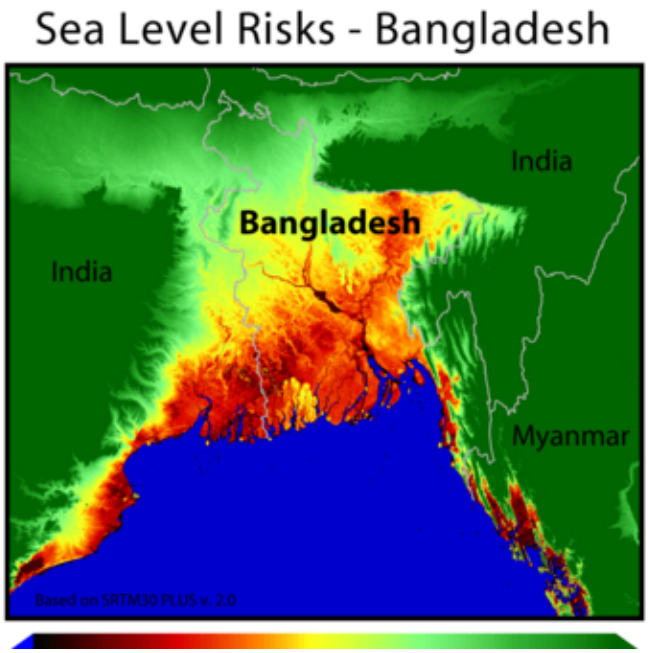

এসব চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় সমানের বছরগুলিতে সরকারকে আরোও কার্যকরী উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নিতে হবে। উন্নয়নের ফলাফল সঠিকভাবে সকলের নিকট পৌছে দিতে হলে উপকূলীয় মানুষের অসহায়ত্ব কমানো এবং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি ইত্যাদি আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। চলমান অসমতা কমানোর জন্য দরিদ্র বান্ধব উন্নয়ন কৌশল বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, জন স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মতো ক্ষেত্রসমূহে বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে।

খ. উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর চাহিদা এবং অগ্রাধিকার বিষয়সমূহ উন্নয়ন কৌশলে কম গুরুত্ব পাচ্ছে

ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ- বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, যদিও কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবদান খুবই নগন্য। উপকূলীয় এলাকা থাকার কারণে বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকি বেড়ে গেছে অনেক গুণ। দেশের মোট এলাকার প্রায় ২০% এলাকা উপকূলীয় এবং এসব এলাকায় বাস করেন প্রায় ৫ কোটি মানুষ। সরকারের তথ্যানুযায়ী উপকূল বাসীদের বেশিরভাগই বাস করেন দারিদ্র সীমার নিচে এবং দারিদ্র প্রবণতা ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ উপকূলীয় এলাকার দিকে সরে যাচ্ছে (ঐওউঝ ২০১০) । উপকূলীয় এলাকায় ইতিমধ্যেই জলবায়ু পরিবর্তনের নানা নেতিবাচক প্রভাব দৃশ্যমান। পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়া এবং পানীয় জলের অভাবের কারণে ফসল উৎপাদন কমে যাওয়ার পাশাপাশি তা উপকূলীয় এলাকার জীবনযাত্রায় বাধাগ্রস্ত করছে। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে স্থানত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন শহুরে এলাকায়, বিশেষ করে ঢাকা-চট্টগ্রামের মতো বড় শহরে অস্থায়ী আবাস গড়ে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের সংখ্যা, প্রবণতা ও তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় উপকূলবাসীদের অর্থিক ও জীবিকার ক্ষতি করছে। ইন্টারন্যাশনাল অরগাইনেজশন ফর মাইগ্রেশন অনুমান করছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং জীবিকার সংকটের কারণে আগামী কয়েক দশকে বাংলাদেশের প্রায় ৬০ লাখ লোক বাস্তুচ্যুত হবে। ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট এনড মনিটরিং সেন্টারও ৩ থেকে ৪ কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুতির আশংকা প্রকাশ করেছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং আর্থিক পরিকল্পনা এখনও যথাযথ নয়। ভয়াবহ সিডর ঘূর্ণিঝড়ের (২০০৭) কারণে বাংলাদেশের প্রায় ৩বিলিয়ন ডলারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা এখনও কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। জাতিসংঘের একটি প্রাতিবেদন অনুযায়ী এই ঘূর্ণিঝড় দেশের ৫% দারিদ্র বৃদ্ধি করেছে। সরকার ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় এলাকাকে রক্ষা করার জন্য পোল্ডার এবং বাধসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের অঙ্গিকার করেছিল এই এলাকার মানুষের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লাক্ষ্যে। কিন্তু সরকারের এই অঙ্গিকার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মতো দীর্ঘ

মেয়াদী পরিকল্পনাগুলোতে প্রতিফলিত হয়নি। সরকার বরং প্রচলিত সনাতন পদ্ধতি এবং সড়ক যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক জোন তৈরির উপর জোর দিচ্ছে। উপকূলীয় এলাকাগুলোকে টেকসই এবং সক্ষম করে তোলার জন্য সরকার কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট নামের একটি সমীক্ষা চালিয়েছে, এই সমীক্ষায় বিশেষজ্ঞ মহল থেকে উপকূল উন্নয়ন বোর্ড গঠন করার এবং উপকূলের জন্য আলাদা বাজেট ও উন্নয়ন পরিকল্পনার সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু এখনও এই ব্যাপারে কোনও অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না।

এ কথা সত্য যে, উপকূলীয় এলাকার জন্য অতি আবশ্যক এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে প্রচুর অর্থ ও কারিগরি সহযোগিতার প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী না হয়েও বাংলাদেশ এর নিষ্পাপ শিকারে পরিনত হয়েছে এবং এই সংকট মোকাবেলায় পর্যাপ্ত অর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বাংলাদেশের নাই। তাই যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিকভাবে দায়ী দেশগুলোর কাছ থেকে অর্থিক সহযোগিতা পাওয়া বাংলাদেশের বৈধ অধিকার।

গ. উন্নয়ন কৌশলে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহনে সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নেই

এটা সারা বিশ্বেই স্বীকৃত যে, উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়নে সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধি, সরকার, ব্যক্তিখাত, এনজিও, গণমাধ্যম, জ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন অংশীদারসহ সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরি। টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা এবং পরীবিক্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার পর থেকেই দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সুশীল সমাজ এবং এনজিও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারের পাশাপাশি এনজিও ও সুশীল সমাজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং দরিদ্র মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। গণমাধ্যম বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ইস্যুতে মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সুশীল সমাজ এমডিজি অর্জনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, এখন তারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদেরকে এসডিজি প্রক্রিয়াতেও সম্পৃক্ত করেছে। কিন্তু সরকারের উন্নয়ন প্রকিয়ায় সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ করার কোনও আইনী কাঠামো এখনও বাংলাদেশে অনুপস্থিত। কিছু সুশীল সমাজ সংগঠন স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করছে। যদিও সরকার এসডিজি প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজের অংশগ্রহণকে স্বীকৃতি দেয়, এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নীতিমালা বা আইনী সুযোগ না থাকায় এবং কখনও কখনও সরকার সুশীল সমাজের ভূমিকাকে যথাযথ গুরত্ব না দেওয়ায় সুশীল সমাজ তার যথাযথ ভূমকা পালনকরতে পারছে না।

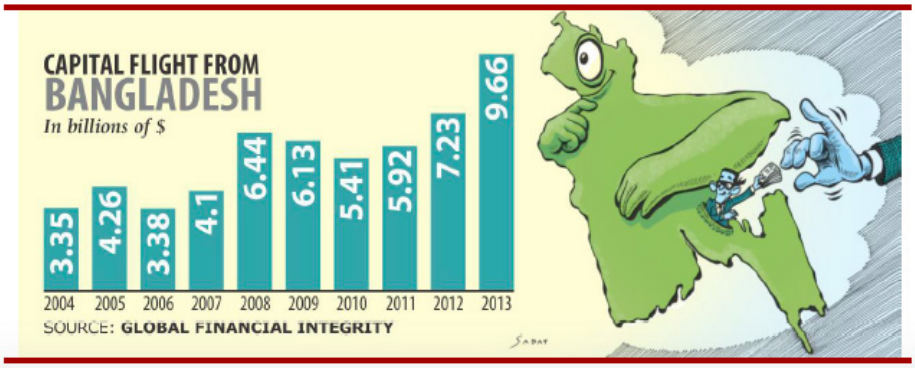

এসডিজির বাস্তবায়ন এবং অর্জনের জন্য সরকার, ব্যক্তি খাত, এবং এনজিও ও সুশীল সমাজসহ অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থাগুলোর অংশগ্রহণ জরুরি, তাই এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ এবং তাদের সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরিতে সরকারকে নীতি কাঠামো প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন এবং দরিদ্র বিমোচন নিশ্চিত করতে শক্তিশালী ও স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়ন কৌশল বাস্তবায়ন, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র বিমোচন এবং স্থানীয় নেতৃত্ব বিনির্মাণে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী, স্বায়ত্বশাসিত এবং বিকেন্দ্রিত শাসন ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঘ. টেকসই উন্নয়নে সম্পদ ব্যবস্থাপনাঃ সরকারকে অবশ্যই অর্থ পাচারের সুযোগগুলো বন্ধ করতে হবে

আগেই বলা হয়েছে যে, এসডিজি লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেওয়া বাংলাদেশের একার পক্ষে প্রায় অসম্ভব, এর পিছনে নানা কারণ রয়েছে। অবৈধ অর্থ পাচার বন্ধ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে সরকারের জন্য একটি বড় বাধা বা সংকট হলো অবৈধ অর্থ পাচার। গত এক দশকে অবৈধ অর্থ পাচারের পরিমাণ মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ১.২%। ব্যক্তি খাত এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলো মূলত অবৈধ অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত।

গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি রিপোর্ট ২০১৫ অনুযায়ী ২০০৩ থেকে ২০১৪ সালের সময়কালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫৫.৮৮ বিলিয়ন ডলার বিভিন্ন দেশে অবৈধভাবে পাচার হয়ে গেছে, যা দেশের ২০১৫-২৬ অর্থ বছরের বজেটের প্রায় দেড় গুন। গড়ে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে ৬ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়ে যায়, এ কারণে অবৈধ অর্থ পাচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে ২৬তম। ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়ে যায়, ঐ বছর বিদেশে পাচারকৃত অর্থের পরিমাণ ৯.৭ বিলিয়ন ডলার, যা কিনা ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বৈদেশিক সহায়তার ১২ গুণ এবং বৈদেশিক ঋণের প্রায় ১৪১%! অনেক উন্নত দেশ ব্যক্তি ও কোম্পানির জন্য তথাকথিত কর স্বর্গ বা ট্যাক্সহেভেন তৈরি করেছে। তারা অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে তাদের দেশে অর্থ পাচারে বিভিন্ন ব্যক্তি ও কোম্পানিকে প্ররোচিত করে। অর্থ পাচারের ক্রীড়নক হিসেবে

সুইস ব্যাংক এবং মালয়েশিয়ার সেকেন্ড হোম প্রকল্প হচ্ছে বিশেষ উদাহরণ। সুইস কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২০১৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভিন্ন সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশীদের অর্থ জমা রাখার হার ৪০.৭২% বেড়েছে, ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশীরা ১৭০ মিলিয়ন ডলার বেশি জমা রাখেন। ২০০২ সাল থেকে জুন ২০১৩ সাল পর্যন্ত ২৩৭০ জন বাংলাদেশী মালেয়শিয়ার সেকেন্ড হোম সুবিধা নিয়েছে, এর মাধ্যমে পাচার হয়ে গেছে প্রায় ১.২৮ বিলিয়ন ডলার।

স্বাধীনতালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে অফিসিয়াল ডেভেলমেন্ট এসিসটেন্সের আওতায় বৈদেশিক সহায়তা পেয়ে আসছে। একইসঙ্গে সরকারকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে অবৈধ অর্থ পাচারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতার সঙ্গে। অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সম্পদ সংগ্রহের বড় বাধা হলো এই অবৈধ অর্থ পাচার। উন্নয়ন অর্থায়ন অন্যদিকে বাংলাদেশ ঋণের বোঝা বাড়িয়েছে, দেশটির ঋণের দায় বাড়িয়েছে। গড়ে প্রতি বছর যে অর্থনৈতিক সহায়তা আসে তার থেকে এই ঋণের দায় এবং অবৈধ অর্থের পরিমাণ অনেক গুণে বেশি। প্রতি বছর অবৈধ অর্থ পাচার হয় ১.৩১ বিলিয়ন ডলার যা আমাদের দেশ উৎপাদনের প্রায় ১.১% এবং মাথাপিছু এই অর্থের পরিমাণ দাড়ায় ৮.৬ ডলার (ডেইলি ষ্টার, জুন ২০১৫)। অন্যদিকে সরকার বৈদেশিক সহায়তা পায় মোট দেশজ উৎপাদনের মাত্র ১.১৯%. একারণেই ঋণের বোঝা থেকে বের হয়ে আসতে অবৈধ অর্থ পাচার বন্ধের কোনও বিকল্প নেই।

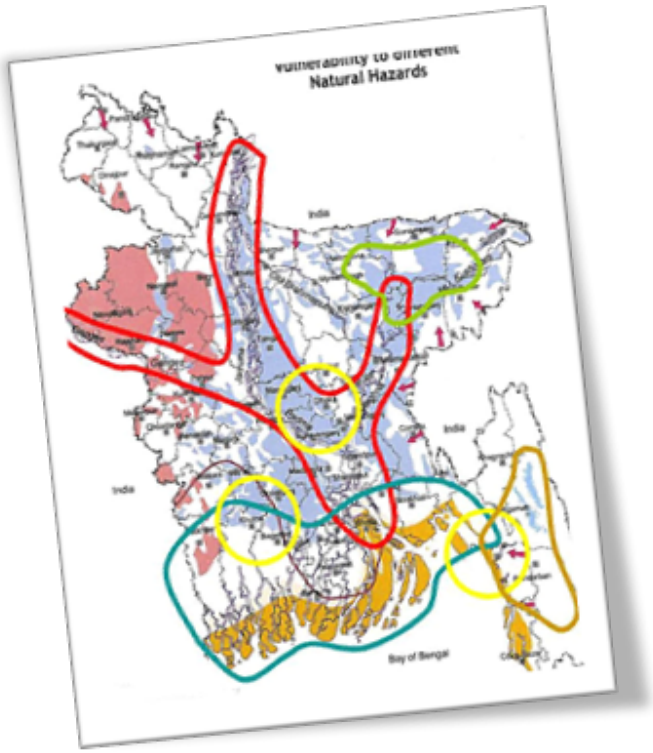

অর্থ পাচার রোধে সরকারের বিদ্যমান আইন ও বিধিগুলো পর্যাপ্ত নয়। কারণ বাংলাদেশের একার পক্ষে অবৈধ অর্থ পাচার বন্ধ সম্ভব নয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কর ফাঁকি রোধ এবং অবৈধ অর্থ পাচার রোধে বৈশ্বিক উদ্যোগ ও সমন্বয় প্রয়োজন। অবৈধ অর্থ পাচার সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় উন্নত দেশগুলো ইধংব উৎড়ংরড়হ ধহফ চৎড়ভরঃ ঝযরভঃরহম (ইউচঝ) নামের একটি উদ্যোগ নিলেও, সেই প্রক্রিয়ায় অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে অর্ন্তভুক্ত করেনি। এতে এটাই প্রমাণ করে যে, উন্নত দেশগুলো আসলে অর্থ পাচারকারীদের পৃষ্ঠপোষক। প্রকৃতপক্ষে এসডিজি অর্জনের জন্য অভ্যন্তরীন সম্পদ সংগ্রহ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা সবচাইতে গুরত্বপূর্ণ। এটা কখনই সফল হতে পারে না যদি অবৈধ অর্থ পাচার বন্ধ করা না যায়। অর্থ পাচার রোধে জাতিসংঘের অধীনে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সুশীল সমাজের দাবি হচ্ছে, জাতিসংঘ ট্যাঙকমিটিকে আধুনিক করে জাতিসংঘ ট্যাঙকমিশন গঠন করা এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংক এবং কর আইন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে গরিব দেশগুলোর সম্পদ আহরণে ধনী দেশগুলোর প্রতিযোগিতা বন্ধ করা যায়।

ঙ. সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ এবং উন্নয়ন কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে দুর্নীতি হ্রাস জরুরি

দুর্নীতি এমন একটি বিষয় যা দেশীয় সম্পদ যথাযথ ব্যবহার এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কার্যকারিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। টিআইবি (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ) তাদের গবেষণায় দেখান যে, দুর্নীতির কারণে প্রতি বছর জিডিপির ২-৩% চুরি হয়ে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর জন্য সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের কম বেতনকে দায়ি করা হয়। এই ধারনা থেকে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন ১০০% উপরে বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির চর্চা পূর্বের চাইতে কমে নাই বরং বেড়েই চলেছে। চলমান প্রেক্ষাপটে দেশের রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহায়তায় এবং তাদের স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা ব্যবস্থাও কোন কোন ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়েছে। সার্বিকভাবে নিম্নস্তর থেকে জাতীয়সংসদ পর্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকর বিরোধী রাজনৈতিক ধারার অনুপস্থিতির কারণেই জবাদিহিতা না করা ও দুর্নীতির চর্চা বেড়েই চলেছে। যদিও আমাদের প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যাক্ত করেছেন, যা এক্ষেত্রে একটি আলোর পথ দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য তাকে আরোও কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। যথা: ১. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালী করা; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, অবাদ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থা, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত এবং পেশাদারিত্বপূর্ণ আমলাতন্ত্র, ২. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহে মূল্যায়ন ও পরীবিক্ষণ শক্তিশালী করা এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও তথ্য প্রকাশ নীতিমালার চর্চা করা, ৩. সরকারের সর্বস্তরে জবাবহিদিতা বৃদ্ধি, জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি এবং স্বচ্ছতা চর্চা বৃদ্ধিসহ স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা।

চ. টেকসই উন্নয়ন অর্জনের জন্য আমাদের দরকার বৈশ্বিক এবং কার্যকর অংশীদারিত্ব

বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার বেলায় বৈশ্বিক অংশিদারিত্ব বিষয়ে বাংলাদেশের অতীত অ ভিজ্ঞতা ভালো না। একই অভিজ্ঞতা অন্যান্য উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোউন্নত দেশের ক্ষেত্রেও। নিরোপিত চাহিদা মতে এমডিজি অর্জনের জন্য প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিলো ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, তার বিপরীতে বাংলাদেশ বছরে সহায়তা পেয়েছে মাত্র ১.৫ মার্কিন ডলার। যে কারণে বাংলাদেশে এমডিজির অনেকগুলি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। যে অর্জনগুলি হয়েছে তা বাংলাদেশ সরকারের একক উদ্যোগ এবং রাজনৈতিক অঙ্গীকারের কারণে হয়েছে। এসডিজি অর্জনের জন্য বছরে কি পরিমাণ অর্থ লাগবে তা এখনও নিরুপন করা যায় নাই। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের প্রাথমিক ধারণামতে আর্থিক চাহিদার পরিমাণ এমডিজির সময়কার চাহিদার তুলনায় তিন থেকে চার গুন হবে। যাই হোক এক্ষেত্রে বাংলাদেশে মনে করে বৈশ্বিক অংশিদারিত্বের মাধ্যমে স্বল্পোন্নতদেশের মতোই সমান অর্থিক সহায়তা পাওয়া বাংলাদেশের বৈধ অধিকার। উন্নত বিশ্বের অঙ্গীকার অনুযায়ী বাংলাদেশ বৈদেশিক সহায়তায় তার প্রাপ্য অধিকার চায় (তাদের মোট জাতীয় আয়ের ০.৭%)। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপদাপন্নতার কারণে দারিদ্রতা

বিমোচন ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের জন্য দরিদ্রদের অভিযোজন প্রক্রিয়ার উন্নত করারর জন্য জিসিএফ (গ্রীণ ক্লাইমেট ফান্ড) থেকে আর্থিক সহায়তা পাওয়ার অধিকার বাংলাদেশের রয়েছে। বৈদেশিক সহায়তার বৈশ্বিক প্রক্রিয়া অবশ্যই আইপিওএ (ইস্তানবুল প্লান অফ একশন) অনুসৃত নির্দেশনা মেনে চলা উচিত। স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে বাংলাদেশে বৈদেশিক সহায়তা কাঠামোগত সীমাবদ্ধতাসমূহ উত্তরণের জন্য, অর্থিক এবং জলবায়ু জনিত ক্ষয়ক্ষতি ও অসহায়ত্ব কমিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে।

ছ. সকল স্তরে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ অত্যাবশ্যকীয়

সরকার উন্নয়ন সহযোগী এবং দাতাদের জন্য সময়মতো অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরি করে। বাংলাদেশকে এসডিজি বাস্তবায়নের উপর একটি স্বেচ্ছা পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে এবং যা সরকারকে আগামী জুন মাসে জাতিসংঘ সভায় উপস্থাপন করতে হবে। কিন্তু জাতীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে জনগণের প্রতি সরকারের কোন দায়বদ্ধতা দেখাতে দেখা যায়নি। এর অর্থ স্থানীয় সরকার, সংবাদ মাধ্যম, নাগরিক সমাজ, ব্যাক্তি খাত কারো প্রতিই সরকার জবাবদিহিতা দেখায়নি। অথচ এসডিজি অর্জনে, সম্পদ ব্যবস্থাপনায় এবং নাগরিক উদ্যোগ গ্রহণে এরা সকলেই সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোন কোন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একটি ভুল ধারণা পোষণ করছেন। তারা মনে করেন "গণতন্ত্র নয়, উন্নয়নই আগে দরকার"। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন, একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জনগণ কখনও না খেয়ে মারা যাবেন না। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশীরা জনগণের স্বার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য যুদ্ধ করেছে। বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধ হয়েছিলো চারটি মূল প্রেরণা থেকে যথা; গণতন্ত্র, সামাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ। সৃষ্ঠ ও অবাদ নির্বাচন প্রক্রিয়া, স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন, স্বায়ত্বশাসিত স্থানীয় সরকার এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার মতো যে কোন ধারণাই দায়বদ্ধতা মূলক উন্নয়ন কে বাধাগ্রস্ত করবে।

অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহ

আয়োজক সংগঠনসমূহ: অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, পিএসআই, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, মুক্তির ডাক, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সংগ্রাম, সিডিপি, হিউম্যানিটি ওয়াচ, সিনার্জি বাংলাদেশ, জ্ঞান অধ্যয়ন কেন্দ্র।

Equity and Justcice Working Group Bangladesh (EquityBD)
Secretariate
COAST Trust
House 13, Road 2, Shyamoli, Dhaka, Bangladesh.
Website: www.equitybd.net, www.coastbd.net

equitybd

participates in survival strategies of coastal poor
COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust